কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ৩

সূরা আ'লা

সূরা আল আ'লা পবিত্র কুরআনের ৮৭ তম সূরা; এতে আয়াত সংখ্যা ১৯টি এবং রূকুর সংখ্যা ১টি। এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আ'লা অর্থ সর্বোচ্চ।

নামকরণ

الْأَعْلَى। মহান আল্লাহর একটি সিফাত বা গুণবাচক নাম, যার অর্থ সুউচ্চ। প্রথম আয়াতে উল্লিখিত গুণবাচক নাম থেকেই সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এর আলোচ্য বিষয় থেকে জানা যায়, এটি একেবারে প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্যতম। ষষ্ঠ আয়াতে "আমি তোমাকে পড়িয়ে দেবো, তারপর তুমি আর ভূলবে না" এ বাক্যটিও একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, এটি এমন সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালোভাবে অহী আয়ত্ত্ব করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেননি। এবং অহী নাযিলের সময় তার কোন শব্দ ভুলে যাবেন বলে তিনি আশংকা করতেন। এই আয়াতের সাথে যদি সূরা ত্ব-হা'র ১১৪ আয়াত ও সুরা কিয়ামাহ'র ১৬-১৯ আয়াতগুলোকে মিলিয়ে পড়া হয় এবং তিনটি সূরার সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর বর্ণনাভংগী ও পরিবেশ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে এখানে উল্লেখিত ঘটনাবলীকে নিম্নোক্তভাবে সাজানো যায়: সর্বপ্রথম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে যে, তুমি চিন্তা করো না, আমি এ বাণী তোমাকে পড়িয়ে দেবো এবং তুমি আর ভুলে যাবে না। তারপর বেশ কিছুকাল পরে যখন সূরা কিয়ামাহ নাযিল হতে থাকে তখন তিনি অবচেতনভাবে অহীর শব্দগুলো পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। তখন বলা হয় "হে নবী! এই অহী দ্রুত মুখস্থ করার জন্য নিজের জিহ্বা সঞ্চালন করো না। এগুলো মুখস্থ করানো ও পড়িয়ে দেবার দায়িত্ব আমার। কাজেই যখন আমরা এগুলো পড়ি তখন তুমি এর পড়া মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকো, তারপর এর মানে বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্বও আমার।" শেষবার সূরা ত্ব-হা নাযিলের সময় মানবিক দুর্বলতার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার এই পরপর নাযিল হওয়া ১১৩টি আয়াতের কোন অংশ স্মৃতি থেকে উধাও হয়ে যাবার আশংকা করেন, ফলে তিনি সেগুলো স্মরণ রাখার চেষ্টা করতে থাকেন। এর ফলে তাঁকে বলা হয়: "আর কুরআন পড়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার কাছে এর অহী সম্পূর্ণরূপে পৌঁছে না যায়।" এরপর আর কখনো এমনটি ঘটেনি। নবী (সাঃ) আর কখনো এ ধরনের আশংকা করেননি। কারণ এ তিনটি জায়গা ছাড়া কুরআনের আর কোথাও এ ব্যাপারে কোন ইঙ্গিত নেই।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এই ছোট্ট সূরাটিতে তিনটি বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে। এক, তাওহীদ। দুই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দান। তিন, আখেরাত।

তাওহীদের শিক্ষাকে প্রথম আয়াতের একটি বাক্যের মধ্যেই সীমিত করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে: আল্লাহর নামে তাসবীহ পাঠ করো। অর্থাৎ তাঁকে এমন কোন নামে স্মরণ করা যাবে না যার মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি, অভাব, দোষ, দুর্বলতা বা সৃষ্টির সাথে কোন দিক দিয়ে কোন প্রকার মিল রয়ে গেছে। কারণ দুনিয়ায় যতগুলো ভ্রান্ত আকীদার জন্ম হয়েছে তার সবগুলোর মূলে রয়েছে আল্লাহ সম্পর্কিত কোন না কোন ভুল ধারণা। আল্লাহর পবিত্র সত্তার জন্য কোন ভুল ও বিভ্রান্তিকর

নাম অবলম্বন করার মাধ্যমে এ ভুল ধারণাগুলো বিকশিত হয়েছে। কাজেই আকীদা সংশোধনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে, মহান আল্লাহকে কেবলমাত্র তাঁর উপযোগী পূর্ণ গুণান্বিত ও সর্বাঙ্গ সুন্দর নামে স্মরণ করতে হবে।

এরপর তিনটি আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের এমন এক রবের তাসবীহ পাঠ করার হুকুম দেয়া হয়েছে যিনি বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে সমতা কায়েম করেছেন। তার ভাগ্য তথা তার ক্ষমতাগুলোর সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন এবং যে কাজের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা সম্পন্ন করার পথ তাকে বাতলে দিয়েছেন। তোমরা নিজের চোখে তাঁর ক্ষমতার বিস্ময়কর ও বিচিত্র প্রকাশ দেখে চলছো। তিনি মাটির বুকে উদ্ভিদ ও গাছপালা উৎপন্ন করেন আবার সেগুলোকে প্রাণহীন আবর্জনায় পরিণত করেন। তিনি ছাড়া আর কেউ বসন্তের সজীবতা আনার ক্ষমতা রাখেন না আবার পাতাঝরা শীতের আগমন রোধ করার ক্ষমতাও কারো নেই।

তারপর দু'টি আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে: এই যে কুরআন তোমার প্রতি নাযিল হচ্ছে এর প্রতিটি শব্দ কিভাবে তোমার মুখস্ত থাকবে, এ ব্যাপারে তুমি কোন চিন্তা করো না। একে তোমার স্মৃতিপটে সংরক্ষিত করে দেয়া আমার কাজ। একে তোমার স্মৃতিপটে সংরক্ষিত রাখার পেছনে তোমার নিজস্ব কোন কৃতিত্ব নেই। বরং এটা আমার মেহেরবানীর ফল। নয়তো আমি চাইলে তোমার স্মৃতি থেকে একে মুছে ফেলতে পারি।

এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে: প্রত্যেক ব্যক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়নি। বরং তোমার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র সত্যের প্রচার। আর এই প্রচারের সরল পদ্ধতি হচ্ছে, যে ব্যক্তি উপদেশ শুনতে ও তা মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে তাকে উপদেশ দাও। আর যে ব্যক্তি তাতে প্রস্তুত নয় তার পেছনে লেগে থাকার প্রয়োজন নেই। যার মনে ভুল পথে চলার অশুভ পরিণামের ভয় থাকবে সে সত্য কথা শুনে তা মেনে নেবে এবং যে দুর্ভাগা তা শুনতে ও মেনে নিতে চাইবে না সে নিজের চোখেই নিজের অশুভ পরিণাম দেখে নেবে।

সবশেষে বক্তব্যের সমাপ্তি টেনে বলা হয়েছে: সাফল্য কেবল তাদের জন্য যারা আকীদা- বিশ্বাস, কর্ম ও চরিত্রে পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা অবলম্বন করবে এবং নিজেদের রবের নাম স্মরণ করে নামায পড়বে। কিন্তু লোকেরা শুধুমাত্র এ দুনিয়ার আরাম-আয়েশ এবং এর স্বার্থ ও আশা আনন্দের চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে। অথচ তাদের আসলে আখেরাতের চিন্তা করা উচিত। কারণ এ দুনিয়া তো ক্ষণস্থায়ী। অন্যদিকে আখেরাত চিরস্থায়ী। আর দুনিয়ার নিয়ামতের তুলনায় আখেরাতের নিয়ামত অনেক বেশী ও অনেক উন্নত পর্যায়ের। এ সত্যটি কেবল কুরআনেই কুরআনেই বর্ণনা করা হয়নি, হযরত ইব্রাহীম (আ) ও হযরত মূসার (আ) সহীফাসমূহেও মানুষকে এই একই সত্যের সন্ধান দেয়া হয়েছিল।

গুরুত্ব

হযরত নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দুই ঈদ ও জুম'আর সালাতে সূরা আ'লা ও গাশিয়াহ পাঠ করতেন। এমনকি জুম'আ ও ঈদ একদিনে হলেও তিনি উক্ত দু'টি সূরাই পড়তেন'। [মুসলিম-৮৭৮; মিশকাত-৮৪০]

বারা বিন আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবীগণের মধ্যে মদীনায় প্রথম আসেন মুছ'আব বিন ওমায়ের ও আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম। তারা আমাদেরকে কুরআন পড়াতে থাকেন। অতঃপর আসেন 'আম্মার, বেলাল ও সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ। তারপর বিশ জনের একটি দল নিয়ে আসেন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব। অতঃপর আসেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে। আমি মদীনাবাসীকে কখনো এত খুশী হতে দেখিনি যত খুশী তাঁর আগমনে হতে দেখেছি। এমনকি ছোট্ট শিশু-কিশোররা বলতে থাকে, هَذَا رَسُوْلُ اللهِ قَدْ جَاءَ 'এই যে আল্লাহর রাসূল এসে গেছেন'। তিনি আসা পর্যন্ত আমি পাঠ করতাম সূরা আ'লা এবং অনুরূপ সূরা সমূহ'। [বুখারী -৪৯৪১ 'তাফসীর' অধ্যায়।]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাব্বি হিসমা রব্বিকাল আ'লা পাঠ করার পর বলতেন, সুবহা-না রবিবয়াল আ'লা (মহাপবিত্র আমার প্রতিপালক, যিনি সর্বোচ্চ)। [আহমাদ -২০৬৬; আবুদাঊদ-৮৮৩]

আগের ও পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

আগের সূরা আত ত্বারিকে আল্লাহর নাম ও পরিচিতি সরাসরি বলা হয়নি কিন্তু এই সূরায় শুরুতেই আল্লাহর নামের প্রশংসা করতে বলা হয়েছে। সূরা আত ত্বরিক এর শুরুতে বড় সৃষ্টি যেমন আকাশ, তারা এর কথা এসেছে (আয়াত ১,৩)। আর এই সূরার শুরুতে সবচেয়ে সর্বোচ্চ স্রষ্টা আল্লাহর কথা এসেছে (আয়াত ১)। এছাড়া আগের সূরায় আল্লাহকে ছোট, দূর্বল মনে করে ষড়যন্ত্র করতে থাকে (আয়াত ১৩, ১৪, ১৫)। কিন্তু তিনি আসলে তাদের ধরাছোয়ার বাইরে, অনেক আ'লা (বড়) তা এই সূরার ১ম আয়াতেই বলা হয়েছে।

এর শেষে আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল (সাঃ) কে কাফেরদের পরিকল্পনা ও কর্মকান্ড জেনেও তাদের অবকাশ দেওয়ার জন্য আদেশ করেন। এবং তাদের দিকে মনোযোগ না দিয়ে এই সূরায় তিনি বরং আল্লাহর প্রশংসা করার জন্য আদেশ দেন।

সূরা আ'লার অন্যতম বিষয় হলো পরিশুদ্ধি। ৯ম ও ১০ আয়াতে উপদেশ দান করার কথা মনে করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে পরিশুদ্ধিতে সহায়তার কথা বলা হয়েছে। মানুষ শুধু আরেকজনকে উপদেশ দিতে পারে। অন্যকে পরিশুদ্ধ করতে পারে না। যার নিজের মধ্যে আল্লাহর ভয় আছে সেই নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিতে পারে। এই বিষয়টির আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা এসেছে পরের সূরা আল গাশিয়াহ-তে।

তাফসীর

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

১. আপনি আপনার সুমহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন,

এর শাব্দিক অনুবাদ হবে, "তোমার সুমহান রবের নামকে পবিত্র ও মহিমাময় করো।" এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং সবকটিই এখানে প্রযোজ্য।

এক, আল্লাহকে এমন নামে স্মরণ করতে হবে যা তাঁর উপযোগী। তাঁর মহান সত্তার সাথে এমন নাম সংযুক্ত না করা উচিত যা অর্থের দিক দিয়ে তাঁর অনুপযোগী এবং তাঁর জন্য প্রযোজ্য নয়। অথবা যে নামে তাঁর জন্য কোন ত্রুটি, অমর্যাদা বা শিরকের চিহ্ন পাওয়া যায়। অথবা যাতে তাঁর সত্তা, গুণাবলী বা কার্যবালী সম্পর্কে কোন ভুল বিশ্বাস পাওয়া যায়। এজন্য কুরআন মজীদে আল্লাহ নিজেই নিজের জন্য যেসব নাম ব্যবহার করেছেন অথবা অন্য ভাষায় এই নামগুলোর সঠিক অনুবাদ যে শব্দগুলোর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো ব্যবহার করাই হবে সবচেয়ে বেশী সংরক্ষিত পদ্ধতি।

দুই, সৃষ্টির জন্য যেসব নাম নির্ধারিত রয়েছে সেগুলো আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা অথবা আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত নামগুলো সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা যাবে না। আর যদি এমন কিছু গুণবাচক নাম থাকে যেগুলো শুধু আল্লাহর জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত না হয়ে থাকে বরং বান্দার জন্যও সেগুলোর ব্যবহার বৈধ হয় যেমন রউফ (পরম স্নেহশীল) রহীম (পরম করুণাময়) করীম (মেহেরবান), সামী (সবকিছু শ্রবণকারী), বসীর (সর্বদ্রষ্টা) ইত্যাদি, তাহলে এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য এ শব্দগুলো যেভাবে ব্যবহার করা হয় বান্দার জন্য ঠিক সেভাবে ব্যবহার করা যাবে না।

তিন, পরম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মর্যাদাসহকারে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে হবে। এমন কোন পদ্ধতিতে বা এমন কোন অবস্থায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা যাবে না, যা তাঁর প্রতি মর্যাদাবোধের পরিপন্থী। যেমন হাসি-ঠাট্টা করতে করতে, মলমূত্র ত্যাগকালে অথবা কোন গোনাহ করার সময় তাঁর নাম উচ্চারণ করা। অথবা এমন লোকদের সামনে তাঁর নাম উচ্চারণ করা যারা তা শুনে বেআদবী করতে থাকবে। এমন মজলিসেও তাঁর নাম বলা যাবে না। যেখানে লোকেরা অশালীন কাজে লিপ্ত থাকে এবং তাঁর নাম উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই তারা বিদ্রূপ করতে থাকবে। আবার এমন অবস্থায়ও তাঁর পবিত্র নাম মুখে আনা যাবে না যখন আশঙ্কা করা হবে যে, শ্রোতা তাঁর নাম শুনে বিরক্তি প্রকাশ করবে।

ইমাম মালেকের (র) জীবনেতিহাসে একথা উল্লেখিত হয়েছে যে, কোন প্রার্থী তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি যদি তাকে তা দিতে না পারতেন তাহলে সাধারণ লোকদের মতো "আল্লাহ তোমাকে দেবেন" একথা না বলে অন্য কোনভাবে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, প্রার্থীকে কিছু না দিয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করলে আসলে তার মনে বিরক্তি ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এ অবস্থায় আল্লাহর নাম নেয়া আমি সঙ্গত মনে করি না। কারণ সে বিরক্তি ও ক্ষোভের সাথে আল্লাহর নাম শুনবে। [তাফহীমুল কুরআন]

الَّذِیْ خَلَقَ فَسَوّٰی

২. যিনি সৃষ্টি করেন অতঃপর সুঠাম করেন।

এখানে মূলত: আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার কারণ ও হেতুসমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে। এ আয়াত এবং এর পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে জগৎ সৃষ্টিতে আল্লাহর অপার রহস্য ও শক্তি সম্পর্কিত কতিপয় কর্মগত গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে।

خَلَقَ -এর অর্থ কেবল সৃষ্টি করাই নয় বরং কোন পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে কোন কিছুকে নাস্তি থেকে আস্তিতে আনয়ন করা। কোন সৃষ্টির এ কাজ করার সাধ্য নেই; একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অপার কুদরতই কোন পূর্ব-নমুনা ব্যতিরেকে যখন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা নাস্তি থেকে আস্তিতে আনয়ন করে।

فَسَوّٰی অর্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ, মজবুত ও সুন্দর করেছেন। অর্থাৎ তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আর যে জিনিসটিই সৃষ্টি করেছেন তাকে সঠিক ও সুঠাম দেহসৌষ্ঠব দান করেছেন। তার মধ্যে ভারসাম্য ও শক্তির অনুপাত সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাকে এমন আকৃতি দান করেছেন যে, তার জন্য এর চেয়ে ভালো আকৃতির কল্পনাই করা যেতে পারে না। একথাটিকে অন্যত্র বলা হয়েছে, "তিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে চমৎকার তৈরি করেছেন।" [সুরা আস-সাজদাহ: ৭]

وَ الَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰی

৩. আর যিনি নির্ধারণ করেন অতঃপর পথনির্দেশ করেন,

প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করার আগে দুনিয়ায় তাকে কি কাজ করতে হবে, এই কাজ করার জন্য তাকে কতটুকু সময় দেয়া হবে, তার আকার-আকৃতি কেমন হবে, তার মধ্যে কি কি গুণাবলী থাকবে, তার স্থান কোথায় হবে, তার জন্য প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব এবং কাজের জন্য কি কি সুযোগ-সুবিধা ও উপায়-উপকরণ সরবরাহ করা হবে, কখন সে অস্তিত্ব লাভ করবে, নিজের অংশের কাজটুকু সে কতদিনে সম্পন্ন করবে এবং কবে কিভাবে খতম

হয়ে যাবে, এসব কিছুই ঠিক করে দিয়েছেন। এই সমগ্র পরিকল্পনাটির সামগ্রিক নাম হচ্ছে "তাকদীর।" বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিসের জন্য এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের জন্য মহান আল্লাহ এই তাকদীর গড়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে, কোন রকম পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই এমনি হঠাৎ উদ্দেশ্যহীনভাবে এই সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন হয়নি। বরং স্রষ্টার সামনে এজন্য একটি পূর্ণ পরিকল্পনা ছিল। সবকিছুই সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন হচ্ছে।

অন্য আয়াতে আছেঃ প্রত্যেক বস্তুর জন্য তাকদীর নির্ধারণ করেছেন, তারপর পথনির্দেশ করেছেন।" [সূরা ত্বাহা: ৫০]

وَ الَّذِیۡۤ اَخۡرَجَ الۡمَرۡعٰی

৪. আর যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন,

মূলে মারআ (مَرۡعَی) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তৃণভূক প্রাণীদের খাদ্যের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার হয়ে থাকে। এই আয়াতের পরবর্তী আলাচনা থেকে বুঝা যায়, এখানে কেবল উদ্ভিদজাত খাদ্যের কথা বলা হয়নি বরং মাটিতে উৎপন্ন সব ধরনের উদ্ভিদের কথাই বলা হয়েছে। [তাফহীমুল কুরআন]

فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحۡوٰی

৫. পরে তা ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন।

غُثَآءً শব্দের অর্থ খড়-কুটা, আবর্জনা; যা বন্যার পানির উপর ভাসমান থাকে। اَحۡوٰی শব্দের অর্থ কৃষ্ণাভ গাঢ় সবুজ রং।

৪-৫ নং আয়াতে আল্লাহ তৃণাদি বলে সকল প্রকারের উদ্ভিদ ও শস্যাদি বুঝিয়েছেন। অতঃপর সেই সবুজ উদ্ভিদ ক্রমে হলুদ অতঃপর এক সময় শুকিয়ে কৃষ্ণাভ হয়ে আবর্জনার রূপ ধারণ করে। এর মাধ্যমে মানুষকে তার ভবিষ্যৎ করুণ পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে যে, তার যৌবনের সৌন্দর্য ও সজীবতা, স্ফূর্তি ও চটুলতা আল্লাহর এক বিশেষ দান। এগুলি সব এক সময় নিঃশেষ হয়ে যাবে। মূল্যহীন আবর্জনা যেমন ঘরের বাইরে ফেলে দেওয়া হয়, তাকেও তার মৃত্যুর পরে তার সন্তান ও নিকটত্মীয়েরা অতি সাধের ঘর হ'তে কবরে ফেলে আসবে। যে মহান সত্তার অমোঘ নির্দেশে মানুষের জীবনে এই উত্থান-পতন ঘটে, হে মানুষ সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহর বড়ত্ব ও পবিত্রতা ঘোষণা কর- সুবহানা রাবিবয়াল আ'লা।

سَنُقۡرِئُکَ فَلَا تَنۡسٰۤی

৬. শীঘ্রই আমরা আপনাকে পাঠ করাব, ফলে আপনি ভুলবেন না,

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরত ও হিকমতের কতিপয় বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করার পর এস্থলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে নবুয়তের কর্তব্য সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ দানের পূর্বে তাঁর কাজ সহজ করে দেওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। প্রথমদিকে যখন জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কোরআনের কোন আয়াত শোনাতেন, তখন তিনি আয়াতের শব্দাবলী বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার আশংকায় জিবরাঈল (আঃ)-এর সাথে সাথে তা পাঠ করতেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কোরআন মুখস্থ করানোর দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন এবং ব্যক্ত করেছেন যে, জিবরাঈল (আঃ)-এর চলে যাওয়ার পর কোরআনের আয়াতসমূহ বিশুদ্ধরূপে

পাঠ করানো এবং স্মৃতিতে সংরক্ষিত করা আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি চিন্তিত হবেন না। [মাআরিফুল কুরআন]

সূরা 'ত্বা-হা'র ১১৪ আয়াতে এবং সূরা 'কিয়ামাহ'র ১৬-১৯ আয়াতে এর আলোচনা এসেছে। এই আয়াত থেকে একথা প্রমাণিত হয়, কুরআন যেমন মু'জিযা হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল করা হয়েছিল ঠিক তেমনি মুজিযা হিসেবেই তার প্রতিটি শব্দ তাঁর স্মৃতিতে সংরক্ষিত করে দেয়া হয়েছিল। এর কোন একটি শব্দ তিনি ভুলে যাবেন অথবা একটি শব্দের জায়গায় তাঁর সমার্থক অন্য একটি শব্দ তাঁর মুবারক কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হবে, এ ধরনের সকল সম্ভাবনার পথই বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। [তাফহীমুল কুরআন]

إِلَّا مَا شَآءَ اللهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ مَا يَخْفٰى

৭. আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তা ছাড়া। নিশ্চয় তিনি জানেন যা প্রকাশ্য ও যা গোপনীয়।

এই বাক্যটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক. কুরআনের কিছু আয়াত রহিত করার এক সুবিদিত পদ্ধতি হচ্ছে প্রথম আদেশের বিপরীতে পরিষ্কার দ্বিতীয় আদেশ নাযিল করা। এর আরেকটি পদ্ধতি হলো সংশ্লিষ্ট আয়াতটিই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সকল মুসলিমের স্মৃতি থেকে মুছে দেয়া। এ সম্পর্কে এক আয়াতে আছে, (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا) অর্থাৎ "আমরা কোন আয়াত রহিত করি অথবা আপনার স্মৃতি থেকে উধাও করে দেই।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১০৬] তাই "আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া" বলে রহিত আয়াতগুলোর কথা বলা হয়েছে। দুই, অথবা আয়াতের উদ্দেশ্য, কখনো সাময়িকভাবে আপনার ভুলে যাওয়া এবং কোন আয়াত বা শব্দ আপনার কোন সময় ভুলে যাওয়া এই ওয়াদার ব্যতিক্রম। যে ব্যাপারে ওয়াদা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, আপনি স্থায়ীভাবে কুরআনের কোন শব্দ ভুলে যাবেন না।

হাদীসে আছে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন একটি সূরা তেলাওয়াত করলেন এবং মাঝখান থেকে একটি আয়াত বাদ পড়ল। ওহী লেখক উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু মনে করলেন যে, আয়াতটি বোধ হয় মনসুখ হয়ে গেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসার জওয়াবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ মনসুখ হয়নি, আমিই ভুলক্রমে পাঠ করিনি। [মুসনাদে আহমাদ: ৩/৪০৭] অন্য হাদীসে এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সাহাবীকে কোন আয়াত পড়তে শোনে বললেন, আল্লাহ তাকে রহমত করুন, আমাকে এ আয়াতটি ভুলিয়ে দেয়া হয়েছিল এখন মনে পড়েছে। [মুসলিম: ৭৮৮] অতএব, উল্লিখিত ব্যতিক্রমের সারমর্ম এই যে, সাময়িকভাবে কোন আয়াত ভুলে যাওয়া অতঃপর তা স্মরণে আসা বর্ণিত প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী নয়। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

وَ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى

৮. আর আমরা আপনার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ।

এ কথাটিও ব্যাপক। যেমন, আমি তোমার জন্য অহীকে সহজ করে দেব, যাতে তা মুখস্থ করা এবং তার উপর আমল করা সহজ হয়ে যায়। তোমাকে সেই পথ প্রদর্শন করব, যা হবে সরল। যে আমল জান্নাতে নিয়ে যাবে, আমি তোমার জন্য সেই আমল সহজ করে দেব। আমি তোমার জন্য ঐ সমস্ত কর্ম ও কথাকে সহজ করে দেব, যাতে মঙ্গল নিহিত আছে এবং আমি তোমার জন্য এমন শরীয়ত নির্ধারণ করব, যা সহজ, সরল এবং মধ্যপন্থী হবে; যার মধ্যে কোন প্রকার বক্রতা, কঠিনতা ও সংকীর্ণতা নেই। [আহসানুল বায়ান]

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই এ দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি এতে কঠোরতা করবে, এটি তাকে পরাভূত করবে। অতএব তোমরা দৃঢ়ভাবে সৎকর্ম কর, মধ্যপন্থা অবলম্বন কর ও মানুষকে সুসংবাদ প্রদান কর'। [বুখারী ৩৯] তিনি বলেন, 'তোমরা মানুষকে সুসংবাদ শুনাও, তাড়িয়ে দিয়ো না। সহজ কর, কঠিন করো না'। [বুখারী ৬৯]

فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى

৯. অতঃপর উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয় তবে উপদেশ দিন;

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে নবুয়তের কর্তব্য পালনে আল্লাহর প্রদত্ত সুবিধাদির বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে রসুলুল্লাহ (সা)-কে এই কর্তব্য পালনের আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থ এই যে, উপদেশ ফলপ্রসূ হলে আপনি মানুষকে উপদেশ দিন। এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয় বরং আদেশকে জোরদার করাই উদ্দেশ্য। আমাদের পরিভাষায় এর দৃষ্টান্ত কাউকে এরূপ বলা যে, যদি তুমি মানুষ হও তবে তোমাকে কাজ করতে হবে। অথবা তুমি যদি অমুকের ছেলে হও তবে একাজ করা উচিত। বলা বাহুল্য, এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয় বরং কাজটি যে অপরিহার্য, তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, উপদেশ ও প্রচার যে ফলপ্রসূ, একথা নিশ্চিত, তাই এই উপকারী উপদেশ আপনি কোন সময় পরিত্যাগ করবেন না। [মাআরিফুল কুরআন]

এই আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ ওয়ায-নসীহত এবং শিক্ষাদানের একটি নীতি ও আদর্শ বর্ণনা করেছেন। যেমন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তুমি যদি এমন কওমের কাছে কোন কথা বল যা তাদের বিবেকে ঢুকবে না, তাহলে সেটা তাদের কারও কারও জন্য বিপদের কারণ হবে। তারপর তিনি বললেন, মানুষ যা চিনে তা-ই শুধু তাদেরকে জানাও, তুমি কি চাও যে লোকেরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করুক? [ইবনে কাসীর]

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى

১০. যে ভয় করে সেই উপদেশ গ্রহণ করবে।

অর্থাৎ প্রমাণ নাযিল হওয়ার পরে এবং দলীল প্রকাশিত হওয়ার পরে যারা তা অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করার পরিণামে আল্লাহর শাস্তির ভয় করে, তারা সত্বর উপদেশ গ্রহণ করবে। এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহভীরুতার গুণটি মানুষের ফিৎরাত বা স্বভাবজাত বিষয়। প্রতিটি মানুষের অবচেতন মনে আল্লাহকে স্বীকার করার ও তাঁর আদেশ পালন করার যোগ্যতা রয়েছে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, 'আল্লাহ প্রদত্ত ফিৎরাত (বা যোগ্যতা) সেটাই, যার উপরে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। যার কোন পরিবর্তন নেই' (রূম ৩০)। হাদীসে এসেছে- 'প্রত্যেক মানবশিশু ফিৎরাতের উপরে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, নাছারা বা মজূসী বানায়'। [বুখারী-১৩৮৫] অতঃপর প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, 'যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহের মাধ্যমে উপদেশ দিলে অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না' (ফুরক্বান ৭৩)। কিন্তু হতভাগ্য যারা তারা শয়তানের কুহকে পড়ে নিজের স্বভাবধর্মের বিরুদ্ধে গিয়ে আল্লাহকে অস্বীকার করে ও তাঁর অবাধ্যতা করে। যেমন পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেন-

وَ يَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى

১১. আর তা উপেক্ষা করবে যে নিতান্ত হতভাগ্য,

যারা হতভাগ্য তারা এ কুরআন থেকে কোন শিক্ষা বা উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে না। তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। যেখানে কোনরূপ আরাম-আয়েশ ও শান্তি-সুখ নেই, বরং আছে চিরস্থায়ী আযাব ও নানা প্রকার যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন: "অতঃপর যারা হতভাগা তারা থাকবে অগ্নিতে এবং সেথায় তাদের জন্য থাকবে চীৎকার ও আর্তনাদ, সেথায় তারা স্থায়ী হবে যতদিন আকাশসমূহ ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন; নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক তাই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন। পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যবান তারা থাকবে জান্নাতে সেথায় তারা স্থায়ী হবে, যত দিন আকাশসমূহ ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন; এটা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।" (সূরা হূদ ১১: ১০৬-১০৮)।

الَّذِیْ یَصْلَی النَّارَ الْکُبْرٰی

১২. যে ভয়াবহ আগুনে দগ্ধ হবে,

ثُمَّ لَا یَمُوْتُ فِیْهَا وَ لَا یَحْیٰی

১৩. তারপর সেখানে সে মরবেও না বাঁচবেও না।

অর্থাৎ তার মৃত্যু হবে না। যার ফলে আযাব থেকে রেহাই পাবে না। আবার বাঁচার মতো বাঁচাবেও না। যার ফলে জীবনের কোন স্বাদ-আহলাদও পাবে না। [ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আর যারা জাহান্নামী; তারা সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না। তবে এমন কিছু লোক হবে যারা গোনাহ করেছিল (কিন্তু মুমিন ছিল) তারা সেখানে মরে যাবে। তারপর যখন তারা কয়লায় পরিণত হবে তখন তাদের জন্য সুপারিশের অনুমতি দেয়া হবে; ফলে তাদেরকে টুকরা টুকরা অবস্থায় নিয়ে এসে জান্নাতের নালাসমূহে প্রসারিত করে রাখা হবে। তারপর বলা হবে, হে জান্নাতীরা তোমরা এদেরকে সিক্ত কর। এতে তারা বন্যায় ভেসে আসা বীজের ন্যায় আবার উৎপন্ন হবে।" [মুসলিম: ১৮৫]

এ হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, আলোচ্য আয়াতে শুধু কাফের মুশরিকদের ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে যে, তারা বাঁচবেও না আবার মরবেও না। অর্থাৎ তারা আরামের বাঁচা বাঁচবে না আবার মৃত্যুও হবে না যে, তারা আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে।

আল্লাহ বলেন, 'সেদিন জাহান্নামীরা তাদের দাররক্ষী (خازن) 'মালেক' ফেরেশতাকে চিৎকার দিয়ে ডেকে বলবে, 'হে মালেক! (এর চাইতে বরং) তোমার প্রতিপালক আমাদের মেরে ফেলে দিন। জবাবে সে বলবে, তোমরা তো এখানেই অবস্থান করবে'। '(আল্লাহ বলবেন,) আমরা তো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছে দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশ ছিলে সত্যকে অপসন্দকারী' (যুখরুফ ৭৭-৭৮)। তাদের শাস্তি বিষয়ে আল্লাহ বলেন, 'যখন তাদের চামড়াগুলো দগ্ধ হয়ে যাবে, তখন আমরা তা পাল্টে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করতে পারে' (নিসা ৫৬)। তিনি বলেন, 'তাদেরকে মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে না যে তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমরা প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি' (ফাত্বির ৩৬)।

পক্ষান্তরে ঈমানদারদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা জাহান্নামে গেলে সেখানে তাদের গোনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগ করার পর মৃত্যু প্রাপ্ত হবে, ফলে তারা অতিরিক্ত শাস্তি ভোগ থেকে মুক্তি পাবে। এরপর সুপারিশের মাধ্যমে সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে।

قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ تَزَكّٰى

১৪. অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে যে পরিশুদ্ধ হয়।

এখানে পরিশুদ্ধ বা পবিত্রতার অর্থ কুফর ও শির্ক ত্যাগ করে ঈমান আনা, অসৎ আচার-আচরণ ত্যাগ করে সদাচার অবলম্বন করা এবং অসৎকাজ ত্যাগ করে সৎকাজ করা। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যা নাযিল হয়েছে তার অনুসরণ করা। আয়াতের আরেক অর্থ, ধনসম্পদের যাকাত প্রদান করা। তবে যাকাতকেও এ কারণে যাকাত বলা হয় যে, তা ধন-সম্পদকে পরিশুদ্ধ করে। এখানে تَزَكّٰى শব্দের অর্থ ব্যাপক হতে পারে। ফলে ঈমানগত ও চরিত্রগত পরিশুদ্ধি এবং আর্থিক যাকাত প্রদান সবই এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। [ফাতহুল কাদীর]

অর্থ্যাৎ প্রথমে হৃদয়জগতকে আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করা হতে পরিশুদ্ধ করা ও নিজের আমলকে বিদ'আত হতে পবিত্র করা। সঙ্গে সঙ্গে হিংসা-বিদ্বেষ, রিয়া ও অহংকারের মত ধ্বংসকারী রোগসমূহ হতে হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করা এবং পাপ থেকে নিজেকে বিরত রাখা ও সর্বদা আল্লাহর হুকুম মান্য করা। আর্থিক শুদ্ধিতা অর্জনের জন্য আয়-উপার্জনকে হালাল করা ও যাবতীয় হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং যাকাত, ওশর, ছাদাক্বাতুল ফিৎর ও অন্যান্য নফল ছাদাক্বাসমূহ আদায়ের মাধ্যমে নিজেকে কৃপণতার কালিমা হতে পরিশুদ্ধ করা বুঝায়। অর্থাৎ বিশ্বাসে ও কর্মে, কথায় ও আচরণে শুদ্ধাচারী হওয়া।

وَ ذَكَرَ اسۡمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

১৫. এবং তার রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত কায়েম করে।

কেউ কেউ অর্থ করেছেন, তারা তাদের রবের নাম স্মরণ করে এবং সালাত আদায় করে। বাহ্যতঃ এতে ফরয ও নফল সবরকম সালাত অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ ঈদের সালাত দ্বারা এর তাফসীর করে বলেছেন যে, যে যাকাতুল ফিতর এবং ঈদের সালাত আদায় করে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, "নাম স্মরণ করা' বলতে আল্লাহকে মনে মনে স্মরণ করা এবং মুখে তা উচ্চারণ করাও উদ্দেশ্য হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহকে মনে মনে বা মুখে উচ্চারণ করে স্মরণ করেছে, তারপর সালাত আদায় করেছে। সে শুধু আল্লাহর স্মরণ করেই ক্ষান্ত থাকেনি বরং নিয়মিত সালাত আদায়ে ব্যাপৃত ছিল। মূলত: এ সবই আয়াতের অর্থ হতে কোন বাধা নেই। [ফাতহুল কাদীর]

মোদ্দাকথা আয়াত দু'টির প্রকাশ্য অর্থ এই যে, সেই ব্যক্তি সফলকাম হবে, যে ব্যক্তি পরিশুদ্ধি অর্জন করবে। যা শিরক ও নিফাক হতে আত্মার পরিশুদ্ধি এবং ফরয যাকাত ও নফল সাদাক্বাসমূহ আদায়ের মাধ্যমে মালের পরিশুদ্ধি সবকিছুকে শামিল করে। অতঃপর বিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহর নাম স্মরণ করবে এবং সালাত আদায় করবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ 'তুমি সালাত কায়েম কর আমাকে স্মরণ করার জন্য' (ত্বোয়াহা -১৪)। এই সালাত ফরয, সুন্নাত, নফল সকল প্রকার সালাতকে শামিল করে। যা স্রেফ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হবে। কোনরূপ রিয়া বা শ্রুতির উদ্দেশ্যে নয়।

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

১৬. কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও,

অর্থাৎ তোমরা আখেরাতের উপর পার্থিব জীবনকেই প্রাধান্য দিচ্ছ, অথচ প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের জীবনকে দুনিয়ার জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়ার মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। দুনিয়া তো হলো ক্ষণস্থায়ী, ভঙ্গুর অমর্যাদাকর। পক্ষান্তরে, আখেরাতের জীবন হলো চিরস্থায়ী ও মর্যাদাকর। কোন বুদ্ধিমান লোক অস্থায়ীকে স্থায়ীর উপর এবং মর্যাদাহীনকে মর্যাদাসম্পন্নের উপর প্রাধান্য দিতে পারে না। দুনিয়ার জীবনের জন্যে আখেরাতের জীবনের প্রস্তুতি পরিত্যাগ করতে পারে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেনঃ সাধারণ মানুষের ইহকালকে পরকালের উপর প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এর কারণ এই যে, ইহকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপস্থিত এবং পরকালের নিয়ামত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দৃষ্টি থেকে উধাও ও অনুপস্থিত। তাই অপরিণামদর্শী লোকেরা উপস্থিতকে অনুপস্থিতের উপর মধ্যে প্রাধান্য দিয়ে বসে। যা তাদের জন্য চিরস্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। এ ক্ষতির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা আল্লাহর কিতাবও রসূলগণের মাধ্যমে পরকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছাকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যেন সেগুলো উপস্থিত ও বিদ্যমান। একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যাকে নগদ মনে করে অবলম্বন কর, তা আসলে কৃত্রিম, অসম্পূর্ণ ও দ্রুত ধ্বংসশীল। এরূপ বস্তুতে মজে যাওয়া ও তার জন্য নিজ শক্তি বায় করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এ সত্যকেই ফুটিয়ে তোলার জন্য অতঃপর বলা হয়েছে।

وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى

১৭. অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।

আখেরাত দু'দিক দিয়ে দুনিয়ার মোকাবিলায় অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। প্রথমত তার সুখ, স্বাচ্ছন্দ, আরাম-আয়েশ দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামতের চাইতে আনেক বেশী ও অনেক উচ্চ পর্যায়ের। দ্বিতীয়ত দুনিয়া ধ্বংসশীল এবং আখেরাত চিরস্থায়ী।

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া তো শুধু এমন যেন তোমাদের কেউ সমূদ্রে তার আঙ্গুল ডুবিয়েছে। তারপর সে যেন দেখে নেয় সে আঙ্গুল কি নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে?" [মুসলিম: ২৮৫৮] রাসূল (সাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়ার (ভোগ-বিলাস) অন্বেষণে লিপ্ত থাকে, আখেরাতকে সে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর যে ব্যক্তি আখেরাতের পাথেয় অন্বেষণে লিপ্ত থাকে, সে দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অতএব তোমরা চিরস্থায়ী আখেরাতের জন্য ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত কর। [মিশকাত ৫১৭৯]

আখেরাতের সুখ-সম্ভার দুনিয়ার চাইতে কত উত্তম সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, 'কেউ জানে না তার কর্মের প্রতিদান হিসাবে কি কি চক্ষু শীতলকারী বস্ত তাদের জন্য লুকিয়ে আছে' (সাজদাহ ১৭)। রাসূল (সাঃ) বলেন, আল্লাহ বলেন,'আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন সুখ-সম্ভার প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শোনেনি এবং মানুষের অন্তর কখনো কল্পনা করেনি'। [বুখারী ৭৪৯৮, মুসলিম ২৮২৪]

إِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُوْلٰى

১৮. নিশ্চয় এটা আছে পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে—

ইবনে কাসীর বলেন যে, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى থেকে (১৪-১৭) বর্ণিত আয়াতসমূহের বক্তব্য হল বিগত ইলাহী ধর্ম ও কিতাবসমূহের শিক্ষাসমূহের সারনির্যাস'। যা মানুষকে দুনিয়াবী লোভ-লালসার কলুষ-কালিমা হতে মুক্ত করে এবং আখেরাতের স্বচ্ছ গুণাবলীতে আলোকিত করে। অতঃপর তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। আল্লাহ বলেন, এসব কথা ইবরাহীম ও মূসার কিতাব ও পুস্তিকাসমূহে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى

১৯. ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে।

এর মাধ্যমে পূর্বের আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাথে সাথে ইবরাহীম ও মূসা (আঃ)-এর ছহীফার উচ্চ মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে'। এখানে الصُحُفُ বলতে الكتب السماوية الماضية 'বিগত আসমানী কিতাবসমূহ' বুঝানো হয়েছে। প্রসিদ্ধ চারটি কিতাবের বাইরেও পুস্তিকা সমূহ ছিল। সবগুলিকে এখানে الصُحُفُ অর্থাৎ 'ছহীফাসমূহ' বলা হয়েছে। 'ছহীফা' অর্থ, পুস্তিকা।

এই দ্বিতীয়বারের মতো কুরআনে হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত মূসা (আ) এর সহীফা শিক্ষার বরাত দেয়া হয়েছে। এর আগে সূরা আন নাজমের তৃতীয় রুকূ'তে আর একবার এ ধরনের বরাত দেয়া হয়েছে।

ফুটনোট

⊡ সূরাটিতে তিনটি বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে। এক, তাওহীদ। দুই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দান। তিন, আখেরাত।

⊡ সূরার প্রথম আয়াত পড়ে سبحان ربي الأعلي বলা মুস্তাহাব।

⊡রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দুই ঈদ ও জুম'আর সালাতে সূরা আ'লা ও গাশিয়াহ পাঠ করতেন।

⊡ রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন- এর অর্থ হলো-

- আল্লাহকে এমন নামে স্মরণ করতে হবে যা তাঁর উপযোগী।
- সৃষ্টির জন্য যেসব নাম নির্ধারিত রয়েছে সেগুলো আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা অথবা আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত নামগুলো সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা যাবে না।
- পরম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মর্যাদাসহকারে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে হবে।

⊡ মানুষ পৃথিবীর পিছে ছুটতে থাকে কিন্তু যখন পৃথিবী তার হাতের মুঠোয় আসে তখন সে বুঝতে পারে যে, এটি ছিলো অর্থহীন, নগন্য, অস্থায়ী। তখন বুঝে আসে যে, সে বিফল হয়েছে। সুতরাং দুনিয়ার পিছে না ছুটে আখিরাতের পিছনে ছুটতে হবে। তাহলেই সফলতা আসবে।

⊡ সফল সেই ব্যক্তি যে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করেছে, আল্লাহকে স্মরণ করেছে এবং সালাত কায়েম করেছে।